International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 59-64
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.59-68

চন্দন সেনগুপ্তের 'অন্য পৃথিবী': দেশভাগের এক ব্যতিক্রমী আখ্যান

রূপশ্রী দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abtract:

Chandan Sengupta was a talented theater artist and an active theater worker in Tripura. He has played an important role in the development of theatre movement. His enthusiasm in the practice and development of drama is examplary for any theater artist. Natyabhumi, a papular theater group of Tripura was established in 1993 and he was associated with Natyabhumi from the beginning. Since his death in 1996, theater festivals are celebrated in Tripura to pay respect to him and his work. His writing focuses on contemporary social issues, closely examines the contemporary Middle Class, reflecting a crisis in human relationships and the changing values of the present era, as well as the generation of society's moral fiber.

'Anya Prithibi' (অন্য পৃথিবী) is one of his popular works. The play won the first prize in the all India drama competition. This Drama is a different narrative of 1947's partition of India. As a socially conscious artist, he depicted the crisis and insecurities of the people of Punjab and Bangladesh who were the victims of the partition of India. In this play, he shows the triumph of love and humanity by subverting the hatred and violence in the context of Partition. The present paper intends to portray the struggle of people after partition in the context of Chandan Sengupta's drama Anya Prithibi.

Krywords: Chandan Sengupta, Drama, Tripura, Anya Prithibi, Partition.

ত্রিপুরার নাট্য-জগতের এক প্রতিভাবান শিল্পীর নাম চন্দন সেনগুপ্ত (১৯৪৫-১৯৯৬)। এ রাজ্যের নাট্য আন্দোলনের প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি ত্রিপুরার একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও সক্রিয় নাট্যকর্মী ছিলেন। ত্রিপুরার খোয়াই শহরের ছোট্ট পরিমণ্ডল থেকেই তিনি নাট্য জগতের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এবং আজীবন নিজের নাট্য রচনাকে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন। সঞ্জয় কর তাঁর 'নাট্য আন্দোলনে খোয়াই' (২০০২) প্রবন্ধে বলেছেন "খোয়াইয়ের আর একজন কৃতি নাট্যকার যিনি বাংলা নাটকের ভাণ্ডারকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন— চন্দন সেনগুপ্ত 'সাদা পায়রার জন্য' লিখেই প্রথম আলোড়িত করেছিলেন সমগ্র নাট্যাঙ্গনকে। এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৯৬) তিনিই ছিলেন ত্রিপুরার সবচেয়ে ব্যস্ত নাট্যকার।"[১] নাটকের মঞ্চায়ন নিয়ে নানা সময় তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে

উঠতেন। পাশাপাশি নাটকের গঠনপ্রকৃতি বা Form নিয়েও তাঁর নতুন নতুন ভাবনার শেষ ছিল না। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের একাধিক রাজ্যসহ বাংলাদেশে কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরার জনপ্রিয় নাট্যদল 'নাট্যভূমি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাট্যভূমির জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে চন্দন সেনগুপ্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর নাটক 'আরোহণ' প্রযোজনার মধ্য দিয়েই নাট্যভূমির যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরিচালক সঞ্জয় কর বলেছেন— "বর্তমান কঠিন সময়ে জীবননির্বাহের প্রাণপাত সংগ্রামের মধ্যেও এঁরা জনাকয়েক শুধু নাটকের জন্য দল গড়লেন। কারণ একমাত্র নাটকেই তাঁদের আত্মা মুক্তি পায়, নাটক তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রথম ভালোবাসা। নাট্যভূমি গড়ার পিছনে অন্য অনেকের মধ্যে যিনি প্রেরণার, সাহসের মূল উদ্গাতা, তিনি নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত।"[২] ১৯৯৬ সালে তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণের পর তাঁরই নামে ত্রিপুরায় 'চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি নাট্যোৎসব' আয়োজিত হয়ে আসছে। কয়েকদিন ব্যাপী চলা এই উৎসবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা নাট্যদল বিভিন্ন ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করে।

'অন্য পৃথিবী' চন্দন সেনগুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। সর্বভারতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় এই নাটকটি 'শ্রেষ্ঠ নাটক' এর পুরস্কার লাভ করেছিল। দেশভাগের এক ভিন্ন আখ্যান, ভিন্ন নির্মাণ চন্দন সেনগুপ্তের নাটক 'অন্য পৃথিবী'। দেশভাগে বলি হওয়া মানুষের দেশান্তরিত উদ্বাস্তু জীবন, উত্তর প্রজন্মের জীবনে দেশভাগের পরোক্ষ প্রভাব, তাদের সংকট ও বিপন্নতা এই নাটকের স্বল্প পরিসরে চিত্রিত হয়েছে। একজন সমাজ সচেতন প্রগতিশীল নাট্যকার হিসেবে এই নাটকে তিনি যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রেম, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন।

(দুই)

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, সেই সঙ্গে খণ্ডিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। মুসলিম প্রধান প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়, আর হিন্দু প্রধান প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় ভারত। অখণ্ড ভারতভূমির সর্ব ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে অমানবিক ভারত ভাগের ঘটনায় এক বিপন্ন অস্থির সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অখণ্ড পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মানুষকে। একটিমাত্র অমানবিক সিদ্ধান্তই লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। মুহূর্তেই জননী জন্মভূমি বিদেশে পরিণত হয়। সবকিছু ফেলে নিঃস্ব হয়ে 'উদ্বাস্তু' পরিচয় নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। অথচ এই মানুষগুলোর পক্ষে দেশত্যাগ একেবারেই সহজ ছিল না। নতুন আশ্রয়ের খোঁজে আজন্মের ভিটেমাটির সঙ্গে বিচ্ছেদ রচনা করে অচেনা অদেখা অনিশ্চিত পথে বেরিয়ে যাওয়ার যে যন্ত্রণা মানুষ ভোগ করেছিল তা সত্যই বর্ণনাতীত।

ভারতভাগের মতো এত বড় এক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়কে সৃজনশীল মানুষ কোনো ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। ফলে আমাদের সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই দেশভাগের ক্ষত চিহ্নের রূপরেখা স্পষ্ট। উদ্বাস্তু মানুষের সংগ্রাম, নতুন দেশের সমাজ ও মাটিতে ধীরে ধীরে তাদের শিকড় ছড়ানোর ইতিবৃত্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হচ্ছে সাহিত্যে। নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের 'অন্য পৃথিবী' নাটকের প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৯৪৭ সালের ভারতের দেশভাগ ও দেশভাগ পরবর্তী মানুষের সংকট ও বিপন্নতা। স্বল্প আয়তনের এই নাটকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে সেদিন মানুষের সমস্যার সমাধান তো হয়নি বরং তা আরো নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। দেশভাগ সৃষ্ট বিবিধ

সমস্যা আজও উত্তর প্রজন্মের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। 'অন্য পৃথিবী' নাটকে সেসব সমস্যার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

'অন্য পৃথিবী' নাটকের কাহিনি দুই পর্বে বিভক্ত। কাহিনির প্রথম পর্বের প্রেক্ষাপটে আছে ভারত-বাংলাদেশ ভাগ আর দ্বিতীয় পর্বের কাহিনির প্রেক্ষাপটে আছে ভারত-পাকিস্তান ভাগ। নাটকে কোনো অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ নেই। তবে নাটকের ঘটনাস্রোত দৃশ্যান্তরে প্রবাহিত। দেশভাগের ফলে মানুষের জীবন রাতারাতি বদলে গিয়েছিল। বর্তমান প্রজন্মের অস্তিত্বকেও দেশভাগের ঘটনা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, নাট্যকার সেই বিষয়টিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন আলোচ্য নাটকে।

(তিন)

নাটকের প্রথম পর্বে অতনু, জয়নাল ও রহিমচাচা এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাট্য ঘটনা এগিয়েছে। এই পর্বের কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছেন কবি স্বভাবের ভাবুক মানুষ অতনুবাবু ও তাঁর পরিবার। জয়নাল ভার্মা একজন অবাঙালি মানুষ, কর্মসূত্রে যিনি ত্রিপুরায় এসেছেন। জয়নাল ভালো বাংলা জানেন। ত্রিপুরায় আসার পর কবি অতনু বোসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অতনুর পিতা বিনয় বসু মারা গেছেন দুইমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারত দ্বিখণ্ডিত হলে বাধ্য হয়ে শৈশবেই বাংলাদেশ ছেড়ে ত্রিপুরায় এসেছিলেন বিনয় বসু। ছেড়ে আসা দেশ নিয়ে কোনো স্মৃতি কিংবা নস্টালজিয়া অতনুবাবু তাঁর পিতার মধ্যে কখনো লক্ষ করেননি। অথচ হঠাৎ একদিন এক অচেনা যুবকের হাতে প্রয়াত বিনয় বসুর নামে চিঠি আসে। চিঠি লিখেছে বাংলাদেশের রহিম আলী, বিনয় বসুকে সে সম্বোধন করেছে ভাইজান। অচেনা যুবকটি আকুলভাবে অনুরোধ করেছে অতনুর বাবা যেন সেদিন সন্ধ্যায় ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার সংলগ্ন একটি এলাকায় রহিম আলীর জন্য অপেক্ষা করেন। দ্বিধা সংশয়ে জর্জরিত অতনুবাবু জয়নাল ভার্মাকে সঙ্গে নিয়ে চিঠিতে উল্লেখিত স্থানেই রহিম আলীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এক রহস্যজনক সন্ধ্যায় অতনুর সঙ্গে রহিম আলীর দেখা হয়। তারপর ধীরে ধীরে ফেলে আসা অতীতের জট খুলতে থাকে। দেশভাগের পর বিনয় বসু ত্রিপুরায় চলে এলেও তাঁর মা কিন্তু মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। দেশ বিভাগকে অস্বীকার করে বাংলাদেশেই থেকে গিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার এক মুসলমান পরিবার তাঁর দেখাশোনা করতো। রহিম আলী নিজের মায়ের মতোই তাঁকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। তার কথায়— "......ঐ মা যে আমার ভাইজান বিনয় বসুর মা...... ঐ মা যে আমারো আম্মা।"[৩] অন্যদিকে বিনয় বসুর মা রহিম আলীকে সন্তানের মতো ভরসা করতেন, যার জন্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রহিম আলীর আশ্রয়ে থেকে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। আসলে হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় বলেই ধর্ম সেখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন ছিল রহিম আলী। মৃত্যুকালে সে-ই বৃদ্ধার মুখে জল দিয়েছে, মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করেছে। বৃদ্ধার মৃত্যু-সংবাদ এপারে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য, আম্মার গোপালের বিগ্রহ ভাইজানের হাতে তুলে দিতে রহিম আলী রাতের অন্ধকারে বিনয় বসুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রহিম আলীর ভাষায়— "সব বিপদ তুচ্ছ কইরা নদী পার হইয়া চুপি চুপি কত কষ্টে যে এইখানে আইছি— আপনারা জানেন না। আমার মত গরীব চাষীর এইসব শোভা পায় না। তবু আইছি শুধু একটা কথা কইতে আর একটা জিনিস ঐ বিনয় বসুরে দিতে।"[৪]

বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র চাষি রহিম আলী, মুহূর্তের পরিচয়ে অতনুর চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তার এহেন ভূমিকা অতনুবাবুকে বারবার ভাবিয়েছে। রহিম আলী কেন জীবন বাজি রেখে এপারে এসেছিল ?

শুধুই কি কর্তব্য পালন করতে ? অথচ বাংলাদেশে নিজের ঠাকুমা জীবিত আছে জেনেও অতনুর পরিবার তো বৃদ্ধার খোঁজ রাখেনি। রাখবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বৃদ্ধা কোথায় আছেন, কেমন আছেন বা কার দায়িত্বে আছেন, অতনুবাবু কিছুই জানেন না। বৃদ্ধার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলে কষ্ট পেয়েছে রহিম আলী। শেষপর্যন্ত মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছে দিতে রহিম আলী জীবন বাজি রেখে এপারে এসেছে।
আসলে ধর্মই কী সব ? অতনু চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বয়ং নাট্যকার বলেছেন— "ঐ ধর্ম আমি মানিনা-যে ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়......"[৫] রহিম আলী কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী আম্মার মুখে জল দেবার সময় ধর্মের কথা ভাবেনি। যদি ধর্মই সব হতো তবে বিনয় বসুর মা রহিম আলীর আশ্রয়ে থাকতেন না। গোপাল তো বিধর্মী হিন্দুর দেবতা, কেন তাকে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে নিয়ে এল ? রহিম আলী মুসলমান, কেন সে একাজ করলো।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনাত্মীয় রহিম আলী ও বৃদ্ধার মধ্যে মা ও সন্তানের চিরন্তন সম্পর্ক অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। বিনয় বসুর মা ও রহিম আলী দেশ, জাতি ও ধর্মের খোলস মুক্ত যথার্থ মানুষ হয়ে উঠেছেন। এক্ষেত্রে অতনুবাবুর মূল্যায়ন যথার্থ— "এই পৃথিবীর সব সংকীর্ণতার মধ্যেও ওরা গড়ে নিয়েছিল এক স্বতন্ত্র পৃথিবী।"[৬] ওদের সেই পৃথিবীতে ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। খেটে খাওয়া হত দরিদ্র চাষি রহিম আলী তার আচরণের মধ্য দিয়ে সকলকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়ে গেছে। সেই আসলে প্রকৃত মানুষ, তার বুকে জ্বলছে মনুষ্যত্বের আলো, চিরদিনের চিরকালের মানবিকতার শাশ্বত আলো।

(চার)

'অন্য পৃথিবী' নাটকের প্রথম পর্বের কাহিনির সূত্র ধরেই অতনুবাবুর কল্পনায় রচিত হয়েছে নাটকের দ্বিতীয় ভাগের কাহিনি। নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত এই পর্বেও নাটকীয় চমৎকারীত্বে এঁকেছেন প্রেম, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ছবি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকেই বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। দেশ বিভাজনের বিনিময়ে নবজাত এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত বৈরিতাই পেয়ে আসছে। দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধ বেঁধেছে। সেরকমই এক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এই পর্বের কাহিনি। এই পর্বের নাট্য কাহিনির প্রধান কুশীলব আলতাফ ও মনোজিৎ। মনোজিৎ ভারতীয় সৈনিক আর আলতাফ পাকিস্তানের। নাটকীয়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত দুই সৈনিকের দেখা হয়। অনিশ্চিত তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। রক্তক্ষরণে ক্লান্ত আহত আলতাফ জানে না একটু পরে তার সঙ্গে কি ঘটবে, সে আদৌ বেঁচে থাকবে কিনা। অন্যদিকে পথভ্রান্ত মনোজিৎ জানে না অরণ্য থেকে বেরিয়ে যাবার পথ। দুই দেশের দুই সৈনিক তারা, পরস্পরকে খতম করার জন্যে যারা হাতে তুলে নিয়েছে মরণাস্ত্র। অথচ ধীরে ধীরে অবিশ্বাস ও আতঙ্কের আবহাওয়াকে অস্বীকার করে তারা পরস্পরের সহায় হয়ে ওঠে। নাট্যকার নিজেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেছেন— "চরম সংকটে একে অন্যের এ কোন সঙ্গী? শত্রু, না মিত্র? নাকি পরস্পরের অবলম্বন?"[৭]

আহত আলতাফকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে মনোজিৎ। শুধু একটি রাত সে থেকে যেতে চায় আহত আলতাফের সঙ্গে, যাতে আলতাফ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। অথচ ওরা দুজন পরস্পরের শত্রু। যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের শত্রু ধীরে ধীরে একে অন্যের অবলম্বন হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রেই ওদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দানা বাঁধে। প্রচলিত ধ্যান-ধারনার বাইরে গোপনে গোপনে মানুষের মধ্যে, মানুষের সম্পর্কের ভিতর যে সত্য-সুন্দর বিরাজ করে, তা-ই জীবনের অনিশ্চয়তার মুহূর্তে বর্তমানের রূঢ়—মেকী খোলস ছেড়ে

বেরিয়ে আসে দু'জনের মধ্যে। আলোর মশাল জেগে উঠে তাদের অন্তরে। অভ্যস্ত জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতার বাঁধন যায় ছিঁড়ে। এক অনাস্বাদিত আবেগ মনের সব অন্ধকার ঘুচিয়ে ছুটতে থাকে। নাট্যকারের ভাষায়— "যুদ্ধক্ষেত্রের ধূসর মৃত্যুর গহ্বরে জেগে উঠছে সবুজ প্রাণের চিরন্তনতা।"[৮]

মনোজিতের বর্তমান বাড়ি অমৃতসরের ছোট একটি গ্রামে। দেশভাগের আগে মনোজিতের পিতৃপুরুষের আদি বাড়ি ছিল লাহোরের চৌবরা গ্রামে। অন্যদিকে আলতাফের বাপ দাদুর জন্মস্থান অমৃতসরের কান্দেলাবাদে। অর্থাৎ দু'জনেরই পূর্বপুরুষ প্রজন্ম পরম্পরায় অখণ্ড ভারতের নাগরিক ছিল। পুরো দেশটাই ছিল মনোজিৎ আলতাফদের। মনোজিৎ বলতে থাকে— "দেশভাগের ফলে সব কিছু পাল্টে গেছে। তুমি তোমার দেশ দেখোনি— আমি আমার দেশ দেখিনি। আমরা— আমরা শুধু উদ্বাস্তু।"[৯] এই দেশের স্বাধীনতার জন্য দু'জনের দাদু-বাবারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আলতাফ ও মনোজিৎ, যুদ্ধক্ষেত্রের দুই সৈনিকের কথোপকথনে অঙ্কিত হতে থাকে অখণ্ড পরাধীন ভারতের ছবি। আলতাফ ও মনোজিৎ, স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তর প্রজন্ম, তারা কেউই দেশভাগকে মেনে নিতে পারেনি। আলতাফ মনোজিতকে জানায়, "একদিন সমস্ত দেশটা যখন স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে পাগল, তখন তোমার দাদু-আমার দাদু মিটিং-মিছিলে সবার সঙ্গে বলেছে— "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ইংরেজ ভারত ছাড়ো।"[১০]

নাটকের দ্বিতীয় ভাগে নাট্যকার বার বার অতীতে ফিরে গেছেন। ইতিহাসের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ভারতের সেই চিত্রকে অঙ্কন করেছেন, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ শুধুমাত্র ভারতীয় হিসেবে বসবাস করতো। পরাধীন ভারতে লালা লাজপৎ রায় ইংরেজ কর্তৃক প্রহৃত হলে কিংবা দেশের প্রিয় সন্তান ভগৎ সিং-এর মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। দেশের চতুর্দিকে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে প্রত্যেকে প্রতিবাদ করেছিল। এই দেশের ইতিহাস এক, সংগ্রামের ইতিহাস এক, স্বাধীনতার ইতিহাস এক। "আমরা সকলে এক ছিলাম। অথচ আজ আমরা বিচ্ছিন্ন, দু'দেশের নাগরিক— শত্রু।"[১১]

অনেক রক্তের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হলেও অবাঞ্চিত দেশভাগের ঘটনা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ নিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা উত্তর দাঙ্গা, দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটির সঙ্গে অপরটি গভীরভাবে সংযুক্ত। যে দেশের স্বাধীনতার জন্য পাগল ছিলেন মনোজিতের দাদু, যে দেশ নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল, সেই দেশ ছেড়ে তাঁকে আসতে হবে একথা তিনি কখনো ভাবতেই পারেননি। দেশভাগের বলি হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি মারা গেছেন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে। মনোজিতের বাবা খুন হয়েছেন মুসলমানের হাতে। আলতাফ জানায় তার চাচা আজাদ হিন্দু ফৌজে লড়াই করেছেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাদের অবদান কোন অংশেই কম নয়। নাটকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথাও এসেছে। দাঙ্গায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বলেছে। নদীতে ভেসে গেছে হাজার হাজার লাশ। দীর্ঘ দিনের সম্প্রীতির বন্ধনকে তুচ্ছ করে হিন্দুর হাতে নিহত হয়েছে মুসলমান এবং মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছে হিন্দু।

(পাঁচ)

দেশবিভাগ একটি দেশের মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরস্পরকে শত্রু করে তোলে। দু'দেশের মানুষ হত্যালীলায় মত্ত হয়। তবে এতো কিছুর পরও মানুষই বাঁচিয়ে রাখতে পারে পারস্পরিক সম্প্রীতি, মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা। মানুষ চাইলে নিজের ভেতরের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে, অন্যের

অসহায়তায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, মানব স্বভাবের এরূপ সম্ভাবনাকেই জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত 'অন্য পৃথিবী' নাটকে এক নতুন পৃথিবীর নির্মাণ করলেন। আমাদের স্বার্থ সর্বস্ব পরিচিত পৃথিবী থেকে সেই পৃথিবী সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর নির্মিত পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। জীবন বাজি রেখে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সেই পৃথিবীতে জাতি ধর্ম বর্ণ কিংবা গোত্রের পরিবর্তে মানুষকে মানুষ পরিচয়েই গ্রহণ করা হয়। দুই পর্বে বিভক্ত এই নাটকের চরিত্র রহিম আলী, বিনয় বসুর মা, আলতাফ ও মনোজিৎ আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে, উদার করে এবং এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিয়ে যায়।

সূত্র নির্দেশ:

১) শক্তি হালদার (সম্পা.) ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা, দেবকুমার বসু (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২, পৃ- ৩৫৬

২) তদেব, পৃ- ২৪৮

৩) চন্দন সেনগুপ্তের নাট্য সমগ্র, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, পৃ- ৯৭

৪) তদেব, পৃ- ৯৬

৫) তদেব, পৃ- ১১৩

৬) তদেব, পৃ- ১০১

৭) তদেব, পৃ- ১০৯

৮) তদেব, পৃ- ১০৯

৯) তদেব, পৃ- ১১৩

১০) তদেব, পৃ- ১১৪

১১) তদেব, পৃ- ১১৫

গ্রন্থঋণ:

১) ড. শিশির কুমার সিংহ, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক, অক্ষর পাবলিকেশানস্, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

২) শক্তি হালদার (সম্পা.) ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা, দেবকুমার বসু (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২

৩) চন্দন সেনগুপ্তের নাট্য সমগ্র, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা